ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬ (খসড়া)"–এর ওপর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)–এর পর্যালোচনা ও সুপারিশ

২৪ আগস্ট ২০২৬

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি হওয়া ১৩৩টি অধ্যাদেশের মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটি কর্তৃক যাচাই–বাছাইয়ের মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন এবং গুম প্রতিরোধসহ জনগুরুত্বপূর্ণ ১৬টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত না করে পরবর্তী সময়ে অধিকতর যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে নতুন করে আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। সংসদে "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫" পাশ না করার কারণ হিসেবে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, অধ্যাদেশে কিছু অস্পষ্টতা আছে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে অধিকতর যাচাই-বাছাই করে নতুনভাবে আইনটি প্রণয়ন করা হবে। যার ধারাবাহিকতায় সরকার ১৭ মে ২০২৬ "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০২৬"–এর খসড়া প্রণয়ন করে এবং আইন ও বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে সর্বসাধারণের মতামত সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। আইনের খসড়া প্রণয়ন ও প্রকাশের পর তা পর্যবেক্ষণ করে গত ৮ জুন ২০২৬ তারিখে টিআইবি এককভাবে[১] এবং ৭ জুলাই ২০২৬ তারিখে হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ-এর সাথে যৌথভাবে খসড়া আইনের বিভিন্ন উদ্বেগজনক ধারা চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন পূর্বক সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে তা সংশোধনের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ প্রস্তাব করে।[২] খসড়া আইন পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এখানে কয়েকটি নতুন ধারা যুক্ত করা হয়েছে, যা ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে উন্নততর সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। তবে খসড়া আইনে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫'-এর তুলনায় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য সৃষ্টি করা হয়, যা সরকারি প্রভাবমুক্ত একটি প্রকৃত স্বাধীন ও কার্যকর জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকাল লালিত জনপ্রত্যাশার পরিপন্থি। আইনের এসকল ধারা প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইনস্টিটিউশনস (জিএএনএইচআরআই) থেকে বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের "এ" স্ট্যাটাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করার ঝুঁকি তৈরি করবে বলে আশঙ্কা রয়েছে। একইসাথে যা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারের পরিপন্থী।

পরবর্তীতে খসড়া আইনে কিছু পরিবর্তন করে ১০ আগস্ট ২০২৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সভায় তা অনুমোদন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত খসড়া আইনে কিছু ইতিবাচক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা টিআইবি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, বাছাই কমিটিতে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা; কমিশনের কার্যাবলীর মধ্যে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য সংকটাপন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের সাথে দেশীয় আইনের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য পরীক্ষা, মানবাধিকার সংরক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে হয়রানি থেকে সুরক্ষা প্রদানে প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ, নাগরিক সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা, তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে মানবাধিকার উন্নয়নে অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা; কমিশনকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান ইত্যাদি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে আইনের খসড়ার ওপর অংশীজনদের পক্ষ থেকে যেসব বিধানাবলী কমিশনের স্বাধীন ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বলে সতর্ক করা হয়েছিলো তা উপেক্ষা করে বিষয়গুলো বহাল রাখা হয়েছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯'- এর কিছু ধারা খসড়া আইনে হুবহু প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে ২০০৯ সালের আইনের বিদ্যমান ধারার চাইতেও অবনমন হয়েছে যা গভীর হতাশাজনক।

এমতাবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া আইনটির যে সব ধারা স্বাধীন ও কার্যকর মানবাধিকার কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক ও কমিশনের স্বকীয়তা বিনষ্টের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে, সরকারের পুন:বিবেচনার জন্য টিআইবি এবিষয়ক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরার পাশাপাশি যথাযথ গুরুত্বসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে সংশোধনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে –

[১] বিস্তারিত জানতে দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/bn/articles/law-review/7496
[২] বিস্তারিত জানতে দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/bn/articles/policy-brief/7511

স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা (ধারা ৩)

পর্যবেক্ষণ: 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫'–এর "কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হইবে যাহা সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীনে হইবে না" এই ধারা থেকে "যাহা সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীনে হইবে না" বাক্যাংশটি বাদ দেওয়ার মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক কমিশনকে করায়ত্তের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা প্যারিস নীতিমালার *'একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন এবং স্বাধীনভাবে এর দায়িত্ব পালন করার'* নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

> **সুপারিশ-১:** খসড়া আইনের ধারা ৩(২)–এ "কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হবে, যা সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের আওতাধীন থাকবে না"–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

কমিশনের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের এখতিয়ার (ধারা ৪)

পর্যবেক্ষণ: ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে ঢাকায় কমিশনের প্রধান কার্যালয়সহ প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় এবং কমিশনের প্রয়োজনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যালয় স্থাপনের এখতিয়ার প্রদান করা হলেও, খসড়া আইনে ঢাকার বাইরে বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের বাধ্যবাধকতা বাদ দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এই ধারায় কমিশনের কার্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতাও যুক্ত করা হয়েছে। যা প্যারিস নীতিমালার *'একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন এবং স্বাধীনভাবে এর দায়িত্ব পালন করার'* নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকি ২০০৯ সালের আইনেও কার্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা ছিল না।

> **সুপারিশ-২:** খসড়া আইনের ধারা ৪–এ "কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হবে এবং প্রতি বিভাগে এর বিভাগীয় কার্যালয় থাকবে এবং কমিশন প্রয়োজনে, জেলা, উপজেলা ও ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় অন্য যে কোনো স্থানে কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে"–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে এবং কার্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা বাতিল করে কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা সুসংহত করতে হবে।

কমিশন গঠনে বহুত্ববাদী প্রতিনিধিত্ব (ধারা ৫)

পর্যবেক্ষণ

- ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে কমিশনারগণের মধ্যে কমপক্ষে এক জন "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর" বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং কমপক্ষে দুইজন নারী কমিশনার রাখার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছিল। কিন্তু খসড়া আইনে ন্যূনতম একজন নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তির বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে এবং "যোগ্য প্রার্থী থাকার" শর্ত যুক্ত করে কমিশনার হিসেবে একজন "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী" বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি "অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা" করার কথা বলা হয়েছে। ২০০৯ সালের আইনেও একজন 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর' সদস্যকে কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করার বাধ্যবাধকতা ছিল। খসড়া আইনের এই ধারা কমিশনকে "পুরুষতান্ত্রিক" ও "সংখ্যাগরিষ্ঠতান্ত্রিক" প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে।

- প্যারিস নীতিমালায় জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠনে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারে সম্পৃক্ত (নাগরিক সমাজের) সামাজিক শক্তিগুলোর বহুত্ববাদী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের নীতির সঙ্গে এই ধারা সাংঘর্ষিক।

> **সুপারিশ-৩:** খসড়া আইনের ধারা ৫–এ কমিশনের চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণ নিয়োগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে একজন "ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর" বা প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি ও জেন্ডার বৈচিত্র্যসহ অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং কমিশনে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করতে কমপক্ষে দুইজন নারী কমিশনার রাখার সুস্পষ্ট বিধান যুক্ত করতে হবে।

চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও অযোগ্যতা (ধারা ৬)

পর্যবেক্ষণ

- খসড়া আইনে একজন সরকারি কর্মচারীকে স্বীয় পদে চাকরিরত থাকা অবস্থায় প্রেষণ, লিয়েন বা অবৈতনিক ছুটি নিয়ে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, যা স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ও নিরপেক্ষভাবে কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্তরায় এবং প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

- প্রাথমিক খসড়া আইনে চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগে অযোগ্যতা হিসেবে "ঋণ খেলাপি সাব্যস্ত ও দেউলিয়া ঘোষিত হওয়া" কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তবে মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত খসড়া থেকে "ঋণ খেলাপি সাব্যস্ত" হওয়া অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে ঋণ খেলাপিদের কমিশনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

- এছাড়াও খসড়া আইনে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারদের বয়সসীমা উল্লেখ করা হয়নি।

সুপারিশ-৪: খসড়া আইনের ধারা ৬(৪)(খ)-এ "ঋণ খেলাপি সাব্যস্ত" হওয়াকে চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগের অযোগ্যতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ-৫: খসড়া আইনের ধারা ৬(৪) (গ)-এ উল্লিখিত একজন সরকারি কর্মচারীকে স্বীয় পদে চাকরিরত থাকা অবস্থায় প্রেষণ, লিয়েন বা অবৈতনিক ছুটি নিয়ে কমিশনার হিসেবে নিয়োগের সুযোগ সংবলিত বিধান বাতিল করতে হবে।

সুপারিশ-৬: চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের বয়সসীমা সর্বনিম্ন ৩৫ থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ বছর করতে হবে।

কমিশনার নিয়োগ বাছাই কমিটি গঠন (ধারা ৭)

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনে কমিশনার নিয়োগ বাছাই কমিটির ৯ জন সদস্যের মধ্যে জাতীয় সংসদের স্পীকার, দুইজন মন্ত্রী, একজন সরকারি দলের সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি দলের তথা নির্বাহী বিভাগের আধিপত্য বা প্রভাব প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার কমিশনকে নিয়ন্ত্রণ, কমিশনের নিয়োগ-প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হওয়া ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

সুপারিশ-৭: 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫' অনুসারে বাছাই কমিটির সদস্য হিসেবে "প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপীল বিভাগের একজন বিচারক (যিনি বাছাই কমিটির সভাপতি), সরকারি দল ও বিরোধী দল কর্তৃক মনোনীত জাতীয় সংসদের দুই জন সংসদ সদস্য; বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশের স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ও মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন অধ্যাপক; জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি বা তদকর্তৃক মনোনীত মানবাধিকার বিষয়ে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সাংবাদিক প্রতিনিধি; রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন নাগরিক প্রতিনিধি এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি, মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে এমন ফোরাম বা সংস্থা বা প্লাটফরমের নিকট থেকে সম্ভাব্য সদস্যদের তালিকা আহ্বান করবেন।

চেয়ারপার্সন ও কমিশনার বাছাই-প্রক্রিয়া (ধারা ৮)

পর্যবেক্ষণ

- খসড়া আইনে চেয়ারপার্সন ও কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাছাইপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ে নির্ধারিত নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড, নাম-পরিচয়সহ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা এবং রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয়সহ তালিকা ইত্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করার বিধান যুক্ত করা হয়নি।

- ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে থাকা বাছাই কমিটি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার বিধানটি খসড়া আইন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সুপারিশ-৮: খসড়া আইনের ধারা ৮-এ স্বচ্ছপ্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাছাইপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দাখিলকৃত দরখাস্ত যাচাই-বাছাইয়ের নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড, নাম-পরিচয়সহ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা এবং রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয়সহ তালিকা ইত্যাদি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা বিষয়ক এই উপ-ধারা যুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ-৯: বাছাই কমিটি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার বিধান যুক্ত করতে হবে।

চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের অপসারণ (ধারা ৯)

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনে বলা হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ব্যতীত চেয়ারপার্সন বা কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যাবে না এবং সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল এতদুদ্দেশ্যে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি প্রণয়ন করবে। তবে খসড়ায় কী কারণে তাদের অপসারণ করা হবে, কোন পদ্ধতিতে তদন্ত করা হবে, তা সুস্পষ্ট করা হয়নি।

সুপারিশ-১০: খসড়া আইনে চেয়ারপার্সন ও কমিশনারগণের অপসারনের পদ্ধতি আরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। একইসঙ্গে, কমিশনের চেয়ারপার্সন কিংবা কমিশনারগণকে অপসারণের ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত কারণ সুস্পষ্ট করতে হবে এবং তদন্ত পদ্ধতি ও তদন্ত কর্তৃপক্ষও সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

কমিশনের কার্যাবলী: অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্তের ক্ষমতা (ধারা ১৩)

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনে কমিশনের কার্যাবলীর মধ্যে [ধারা ১৩ (খ)] শুধুমাত্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্তকালীন বা পরবর্তী সময়ে যেকোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং যেকোনো স্থান, অফিস-আদালত, হাজতখানা বা আটককেন্দ্র পরিদর্শন করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষত্রে এসব স্থান নিয়মিত পরিদর্শনের কোনো সুযোগ রাখা হয়নি। অধিকন্তু এসব স্থান পরিদর্শনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। ২০০৯ সালের আইনে এবং ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে এই ধরনের বাধ্যবাধকতা ছিল না। খসড়া আইনের এই ধারা প্যারিস নীতিমালার *' স্বাধীনভাবে কমিশনের দায়িত্ব পালন করার'* নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। খসড়া আইনের এই ধারায় বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা ও নজরদারি সংস্থা এবং সামরিক বাহিনীর সম্ভাব্য আটকস্থল, যেখানে গুমসহ বিভিন্ন নির্যাতনের জন্য আটককৃত ব্যক্তিদের রাখার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন স্থানসমূহের নিয়মিত অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্ত করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা, এ সকল স্থান আইনবহির্ভূত হলে তা বন্ধ করা ও দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সুপারিশ-১১: খসড়া আইনের ধারা ১৩ (খ) সংশোধন করে "সকল আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা ও নজরদারি সংস্থা এবং সামরিক বাহিনীর সম্ভাব্য আটকস্থল, যেখানে গুমসহ বিভিন্ন নির্যাতনের জন্য আটককৃত ব্যক্তিদের রাখার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন স্থানসমূহের নিয়মিত অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তদন্ত করা এবং এইরূপ স্থান ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা এবং এ সকল স্থান আইনবহির্ভূত হলে, তা বন্ধ করা ও দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সরকারের নিকট সুপারিশ করার বিধান যুক্ত করতে হবে।

কমিশনের কার্যাবলী (ধারা ১৩)

পর্যবেক্ষণ

- কমিশনের কার্যাবলীর মধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দেওয়া হয়েছে, যা ২০০৯ সালের আইনে এবং ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেমন-
  - কমিশনে অভিযোগ দায়েরের জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে আইনি সহায়তা প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
  - মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
  - আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের সাথে শুধুমাত্র বিদ্যমান আইনের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু কমিশনের প্রস্তাবিত আইনের সাদৃশ্য পরীক্ষার সুযোগ রাখা হয়নি।
  - "মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোনো কাজ করার বিধান" এই ধারা থেকে বাদ দেওয়ার মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রমকে সংকুচিত করা হয়েছে।

সুপারিশ-১২: খসড়া আইনের কমিশনের কার্যাবলীর মধ্যে (ধারা ১৩) নিম্নোক্ত বিষয়গুলো যুক্ত করতে হবে–

১২.১: কমিশনে অভিযোগ দায়েরের জন্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে আইনি সহায়তা প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১২.২: মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১২.৩: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের সাথে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত দেশীয় আইনের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য পরীক্ষার বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১২.৪: মানবাধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোনো কাজ করার বিধান যুক্ত করতে হবে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অজুহাত অগ্রহণযোগ্য

পর্যবেক্ষণ: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫- এ "মানবাধিকার লঙ্ঘনে অজুহাত অগ্রহণযোগ্য" নামে একটি পৃথক ধারা ছিল যেখানে বলা ছিল সংবিধান বা বলবৎ কোনো আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে সমর্থিত না হলে, কেবল সরকারি বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক করা হয়েছে, এমন অজুহাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় হতে রেহাই পাওয়া যাবে না। এবং প্রাথমিক খসড়া আইনেও এই ধারাটি বহাল রাখা হয়। তবে মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত খসড়ায় এই ধারাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বা সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন অজুহাত দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

> **সুপারিশ ১৩:** আইনে "মানবাধিকার লঙ্ঘনে অজুহাত অগ্রহণযোগ্য। সংবিধান বা বলবৎ কোনো আইন দ্বারা স্পষ্টভাবে সমর্থিত না হলে, কেবল সরকারি বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক করা হয়েছে, এইরূপ অজুহাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায় হতে রেহাই পাওয়া যাবে না।" এই ধারাটি যুক্ত করতে হবে।

অভিযোগ গ্রহণ (ধারা ১৪)

পর্যবেক্ষণ: খসড়া আইনে নারী, শিশু, হিজড়া, জেন্ডার বৈচিত্র্য, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং প্রান্তিক বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিবেচনায়, তাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণ সহজীকরণে কোনো বিশেষ বিধান রাখা হয়নি।

> **সুপারিশ-১৪:** ঝুঁকি, স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীলতা বিবেচনায় নারী, শিশু, হিজড়া, জেন্ডার বৈচিত্র, প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী এবং প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত ও প্রতিকারে বিশেষ বা পৃথক "সেল" গঠন করার বিধান যুক্ত করতে হবে। সেইসঙ্গে, দুর্গম ও প্রান্তিক এলাকায় সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকায় "মোবাইল টিম" প্রেরণের বিধান যুক্ত করতে হবে।

অভিযোগ তদন্ত ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের এখতিয়ার (ধারা ১৫)

পর্যবেক্ষণ: ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে "অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী বা শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য হলে তাকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমতে, কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকার বা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে না" এমন বিধান থাকলেও ২০২৬ সালের খসড়া আইনে এ বিষয়ক সুস্পষ্ট নির্দেশনা নাই।

> **সুপারিশ-১৫:** খসড়া আইনের ধারা ১৫ (৫)-তে "অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকারি কর্মচারী বা শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য হলে তাকে গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমতে, কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সরকার বা সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হবে না"–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আমলে নেওয়া (ধারা ১৫)

পর্যবেক্ষণ

- খসড়া আইনে কোনো অভিযোগ দায়ের বা তথ্য প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার "স্বীয় বিবেচনায়" উক্ত অভিযোগ আমলে নেওয়ার উপযুক্ত মনে করলে, একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার বিধান যুক্ত করার ফলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা রাজনৈতিক বিবেচনায় কোনো অভিযোগকে আমলে নেওয়া বা না নেওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।
- গণমাধ্যম বা অন্য উৎসে মানবাধিকার লঙ্ঘন-সম্পর্কিত প্রকাশিত তথ্য স্বপ্রণোদিত হয়ে আমলে নেওয়া এবং কমিশন বিষয়টি আমলে না নিলে করণীয় কী, তা এই ধারায় সুস্পষ্ট করা হয়নি।

> **সুপারিশ-১৬:** খসড়া আইনের ধারা ১৫ (১)-তে "কোনো অভিযোগ দায়ের অথবা তথ্য প্রাপ্ত হলে অথবা গণমাধ্যমসহ অন্য যে কোনো মাধ্যম হতে মানবাধিকার লঙ্ঘন-সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার নিজে বা একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করার মাধ্যমে অনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে"–এরূপ ধারা যুক্ত করতে হবে।
>
> **সুপারিশ-১৭:** "গণমাধ্যম বা অন্য উৎস থেকে প্রাপ্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন-সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হলে এবং কমিশন বিষয়টি আমলে না নিলে, তার কারণ লিপিবদ্ধ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে"–এরূপ সুস্পষ্ট বিধান যুক্ত করতে হবে।

শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্তের এখতিয়ার (ধারা ১৯)

পর্যবেক্ষণ

- ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত শৃঙ্খলা বাহিনী বা এর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে গুমসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন অনুসন্ধান ও তদন্ত করা এবং অনুসন্ধান বা তদন্ত শেষে শাস্তির পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ বা প্রশাসনিক আদেশ, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করার ক্ষমতা খসড়া আইন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

- প্রাথমিক খসড়া আইনে শৃঙ্খলা-বাহিনীর বিরুদ্ধে গুমসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তের এখতিয়ার সংকুচিত করে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বাহিনী প্রধান বা সরকারের নিকট হতে প্রতিবেদন চাওয়া এবং উক্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বাহিনী প্রধান বা সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদানের মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছিল। তবে মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত খসড়ায় এই ধারাটিকে আরও সংকুচিত করে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রতিবেদন চাওয়া এবং উক্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট সুপারিশ প্রদানের মধ্যে সীমিত করা হয়েছে। খসড়া আইনের এই ধারা প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

- এই ধারা যুক্ত করার ফলে ২০০৯ সালের আইনের চেয়েও খসড়া আইনটির অবনমন হয়েছে।

> **সুপারিশ-১৮:** খসড়া আইনের ধারা ১৯ বাতিল করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে "শৃঙ্খলা বাহিনী বা এর কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে গুমসহ বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও তদন্ত করা এবং অনুসন্ধান বা তদন্ত শেষে শাস্তির পরিমাণ, ক্ষতিপূরণ বা প্রশাসনিক আদেশ, দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান" করার ক্ষমতা সংবলিত বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কমিশনের কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন (ধারা ২৫)

পর্যবেক্ষণ: জনপ্রতিনিধি পর্যায়ে মানবাধিকার-সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানবাধিকার সুরক্ষায় সংসদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি খসড়া আইনে যুক্ত করা হয়নি।

> **সুপারিশ-১৯:** কমিশনের জবাবদিহি ও অধিকতর কার্যকরতা নিশ্চিতে কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন জাতীয় সংসদের স্পীকারের মাধ্যমে সরাসরি সংসদে উপস্থাপনের জন্য সুস্পষ্ট বিধান যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে স্পীকার মানবাধিকার কমিশন থেকে প্রতিবেদন প্রাপ্তির ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে তা সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সেইসঙ্গে, প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং কমিশনের পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক মতবিনিময় সভার পাশাপাশি গণশুনানী আয়োজনের বিধান যুক্ত করতে হবে।

কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ (ধারা ৩০)

পর্যবেক্ষণ

- খসড়া আইনে কমিশনের লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে এবং কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, কমিশনের মোট জনবলের ৩০ শতাংশ পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে, কমিশনে প্রেষণে নিয়োগের বিধান যুক্ত করার ফলে কমিশনের স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা বা প্রভাবমুক্ত বা সরকারি হস্তক্ষেপমুক্ত তদন্ত কার্যক্রম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে, যা প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

- কমিশনের এই ধরনের পদে নিয়োগ-প্রক্রিয়াও সর্বদা সবার জন্য উন্মুক্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত ও যোগ্যতার ভিত্তিতে হতে হবে, এমন বিধান খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

> **সুপারিশ-২০:** খসড়া আইনের ধারা ৩০–এ "প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সরকারি কর্মচারীকে কমিশনে বা কমিশনের তদন্ত দলে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা ১০ শতাংশ হবে এবং এক্ষেত্রে কী কারণে কমিশন বা কমিশনের তদন্ত দলে সরকারী কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগ করা হচ্ছে, তা প্রকাশ করতে হবে। কোনো সরকারি কর্মচারীকে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের দ্বিমত থাকলে কমিশন এ ধরনের নিয়োগ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবে এবং এই ধরনের পদে নিয়োগ-প্রক্রিয়াও সর্বদা সবার জন্য উন্মুক্ত, স্পষ্ট, স্বচ্ছ, যোগ্যতার ভিত্তিতে হতে হবে"– এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইউনিট গঠন (ধারা ৩৩)

পর্যবেক্ষণ:

- প্রাথমিক খসড়া আইনে 'জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিভাগ' বলা হলেও মন্ত্রিসভা অনুমোদিত খসড়া আইনের এটাকে একটি ইউনিট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারায় [ধারা ৩৩ (১)]–এ নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর আচরণ এবং দণ্ডবিরোধী সনদের ঐচ্ছিক প্রটোকল (Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনের চেয়ারপার্সন (যিনি উক্ত বিভাগের প্রধান হবেন), কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন কমিশনার এবং কারাবন্দি বা স্বাধীনতা বঞ্চিতদের অধিকার ও কল্যাণ-সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞ একজন মানবাধিকার কর্মীর সমন্বয়ে জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা ইউনিট গঠনের কথা বলা হয়েছে। তবে এই ইউনিটে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং একজন কমিশনারকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে এর স্বকীয় ও স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হতে পারে।

- প্রাথমিক খসড়া আইনে এই ইউনিটের দায়িত্ব ও এখতিয়ার হিসেবে কারাগার, হাজতখানা, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, থানা, অভিবাসী আটক কেন্দ্র, মানসিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, সামরিক আটক কেন্দ্র, বন্দি বা আটক ব্যক্তিদের পরিবহন যান, সেফ হোম এবং পরিচর্যা কেন্দ্রসহ যে সকল স্থানে স্বাধীনতা হরণ করা হয়, সেই সকল স্থান চিহ্নিত করা এবং উক্ত স্থানসমূহ নিয়মিত এবং পূর্ব ঘোষণা ব্যতিরেকে পরিদর্শন করার বিধান থাকলেও মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত খসড়ায় এই তালিকা থেকে 'সামরিক আটককেন্দ্র' বাদ দেওয়া হয়েছে।

  সুপারিশ-২১: খসড়া আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করে উক্ত বিভাগের সদস্য হিসেবে কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন কমিশনারের পরিবর্তে মানবাধিকার, আইন, ফরেনসিক মেডিসিন, মনোবিজ্ঞান বা মানসিক স্বাস্থ্য, জেন্ডার, বা আটক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার বিধান যুক্ত করতে হবে। একইসঙ্গে, এই বিভাগের সদস্য হিসেবে জেন্ডার বৈচিত্র্যসহ অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

  সুপারিশ-২২: খসড়া আইনে [ধারা ৩৩ (৩) (ক)] সংশোধন করে 'সামরিক আটক কেন্দ্র' চিহ্নিত এবং নিয়মিত ও পূর্ব ঘোষণা ব্যতিরেকে পরিদর্শনের বিধান যুক্ত করতে হবে।

মানবাধিকার কমিশন তহবিল (ধারা ৩৪)

পর্যবেক্ষণ: ধারা ৩৪(৪) এর দফা (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ)–এ উল্লেখিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও অন্য কোনো উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণের অস্পষ্ট ও বিস্তৃত বিধানের ফলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হওয়ায়, রাষ্ট্রীয় তহবিল প্রাপ্তির সুযোগ থাকার পরেও কমিশনের ওপর তহবিল সংগ্রহের মতো অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুপারিশ-২৩: কমিশনের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ সংশ্লিষ্ট "অন্য কোনো" অস্পষ্ট ও বিস্তৃত বিধান বাতিল করতে হবে।

কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা (ধারা ৩৫)

পর্যবেক্ষণ

- ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে বার্ষিক বরাদ্দ নির্ধারণের আগে সরকারকে কমিশন প্রদত্ত নিজস্ব বাজেট প্রস্তাব প্রদান এবং সরকারকে তা বিবেচনা করার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি নিশ্চিত করা হলেও, খসড়া আইনে কমিশনের বাজেট একতরফাভাবে সরকারের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে।

- নির্বাহী হস্তক্ষেপ থেকে সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান করার জন্য ২০২৫ সালের অধ্যাদেশে সংবিধানের ৮৮ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কমিশনারগণের প্রদেয় পারিশ্রমিক ও ভাতাদি সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে পরিশোধের বিধান থাকলেও খসড়া আইনে তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়েছে। খসড়া আইনে এর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা এবং পদ্ধতিগত সুরক্ষাব্যবস্থা না রেখে বাজেটের পরিমাণ এবং কমিশনারদের পারিশ্রমিক উভয়ের ওপরই নির্বাহী বিভাগের পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

  সুপারিশ-২৪: খসড়া আইনের ধারা ৩৫(১) সংশোধন করে "সরকার প্রতি অর্থবছরে কমিশনের ব্যয়ের জন্য কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের অনুকূলে সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত

খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ব্যয় করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হবে না।"–এরূপ বিধান যুক্ত করতে হবে।

সুপারিশ-২৫: খসড়া আইনে কমিশনের ওপর নির্বাহী হস্তক্ষেপ থেকে সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদানের জন্য ২০২৫ সালের অধ্যাদেশের ন্যায় "সংবিধানের ৮৮ নং অনুচ্ছেদের অধীনে কমিশনারগণের প্রদেয় পারিশ্রমিক ও ভাতাদি সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে পরিশোধের"–বিধান যুক্ত করতে হবে।

পরিশেষে, বিএনপি তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করার যে অঙ্গীকার করেছে, আলোচ্য খসড়াটি চূড়ান্ত আইনে পরিণত করার ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে, সরকারসহ সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী সব রাজনৈতিক দলকে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিগত কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে দেশবাসী, বিশেষ করে এই দলগুলোর নেতাকর্মীগণ যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, ভবিষ্যতে সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি রোধে তাদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই বিগতসময়ের অভিজ্ঞতা ও ইশতেহারে ঘোষিত অঙ্গীকার অনুযায়ী আলোচ্য খসড়াটির যে সকল বিতর্কিত ধারাসমূহের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে একটি কার্যকর ও স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠায় সরকারসহ সকল পক্ষ আন্তরিক হবে– সেই প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

*****